মাটির মায়া

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস এম, এস-সি

মূল্য এক টাকা

উৎসর্গ

পিতামাতার পুণ্যস্মৃতিজড়িত

গাঁয়ের ভিটার উদ্দেশে-

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

প্রায় দুই বৎসর পূর্বে 'মাটির মায়ার' প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করি। বাহির হইবার অল্পদিনের মধ্যেই বইখানি রসগ্রাহী বিদ্বৎসমাজে সমাদর লাভ করে। শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুরও অনেকগুলি পুস্তক ক্রয় করিয়া বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বিতরণ করেন। ফলে, কয়েক মাসের মধ্যেই প্রথম সংস্করণের পুস্তকগুলি নিঃশেষ হইয়া যায়।

কাগজের বর্ত্তমান দুষ্প্রাপ্যতা শীঘ্র মিটিবে না বুঝিয়া এবং সুধীজনের প্রশংসায় উৎসাহিত হইয়া দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রণে প্রয়াসী হইয়াছি। পূর্ব কবিতার অনেকগুলির কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া এই সংস্করণে নূতন আরও ৮টি কবিতা যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রচ্ছদপটের সৌষ্ঠব সম্পাদনের জন্য শ্রদ্ধেয় শিল্পী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র কুমার সেন মহাশয়ের নিকট এবং পুস্তকখানির প্রচার-কল্পে সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুরের নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

কলিকাতা,
ফাল্গুন, ১৩৪৯

হরগোপাল বিশ্বাস

সূচী

আম

আম কি কেবল গাছেই ধরেগো আম কি শুধুই ফল ?
আম যে মোদের স্মৃতির ফলকে সদা করে ঝলমল।
পৌষে যখন সিঁদুরে গাছের মুকুল প্রথমে দেখি
আজিও কেন যে পরাণ আমার পুলকে আকুল এ কি !
মাঘ মাসে লাগে সারা গাঁয়ে যেন মুকুল মহোৎসব
মুকুল-গন্ধে মধু দিনরাতি মাতে মৌমাছি সব।
ফাল্গুন মাসে সরিষা হইতে মটরের মত গুটি
চৈত্রের শেষে ছুরি হাতে নিয়ে করি মোরা কাটিকুটি।
পাথর বাটিতে কলার পাতায় কাঁচা আম কেটে রাখি
মুখে আসে জল যেমনি তাহাতে লঙ্কা লবণ মাখি।
অক্ষয় তিথি স্মরণীয় দিন কাসুন্দি হয় ঘরে
বড় মজা ক'রে কাঁচা আম কেটে খাই মোরা তারপরে।
রাইসরিষার তীব্র ঝাঁঝেতে নাকে চোখে জল ঝরে
তবু কাসুন্দি কাঁচা টক্ আম ছেলেরা আদর করে।

দিদির তৈরী নেকড়ার থলি বিছানার পাশে রেখে
প্রথম কাকের ডাক শুনে জেগে ছোট বোনটারে ডেকে—

চোখ মুছে ছুটি আঁধার ভাঙিয়া কাঁচামিঠে গাছতলে
চোখে না পড়িলে হাতে পায়ে খুঁজি পাতা মাঝে কৌশলে।
গুমোট গরম—সহসা বিকালে পশ্চিম দিক থেকে
ঘন কালো মেঘ তাড়াতাড়ি উঠে সূর্য্যেরে ফেলে ঢেকে।
নীচে মিশ-কালো উপরে ধোঁয়াটে মেঘ ক্রমে জোরে ছোটে
বক উড়ে যায় কাক চীৎকারে, ধূলি উড়ে গায়ে ফোটে।
বাঁশঝাড়-ডগা পৃথিবী প্রণমে আমডাল কাঁপে ঝড়ে
আগে পাকা আম পরে কাঁচাপাকা দুপ্‌দাপ ক'রে পড়ে।
করি কাড়াকাড়ি বড় থলি ভরি যে যত কুড়াতে পারি
বাগান হইতে অপর বাগানে ছুটি সবে সারি সারি।
বড় জল ফোঁটা চট্‌পট পড়ে কোনো ফোঁটা বিঁধে গায়
গুড়ুম গুড়ুম মেঘ ডাকে যেই বিদ্যুৎ চমকায়।
এই আসে বায়ু সোঁ সোঁ রবে ধেয়ে এই যায় ক্ষণে থেমে
দেখিতে দেখিতে শিলা সাথে নিয়ে আসে ঘন জল নেমে।
জলের ঝাপটে শীত ক'রে আসে ছুটে চ'লে যাই বাড়ি
বাবা গালি দেন—ভাইবোন করে পাকা আম কাড়াকাড়ি।
পরদিন প্রাতে পিসিমার মোর হাতের বিরাম নাই
তাঁহারি যত্নে বারমাস মোরা আচার আমসি খাই।

জ্যৈষ্ঠ মাসের জোছনা রাত্রে ফুরফুরে হাওয়া দিলে
মাদুর পাতিয়া উঠানে আমরা জুটি ভাইবোনে মিলে

ঘরের পিছনে যোয়ানে গাছের আগডালে থাকে পাকা
উঠিতে পারে না সেখানে কেহই—বাদুড় মেলিতে পাখা
টুপ্‌টাপ ক'রে আমগুলি পড়ে—ছুটিয়া কুড়াতে যাই
যে যে-কটা পাই ভাগাভাগি ক'রে তখনি সকলে খাই।
আমের সুষমা বাঙালীর প্রাণ প্রীতি প্রফুল্ল করে
তাই ভারে ভারে আম চারিধারে ছোটে প্রিয়জন তরে।
জাম দিয়ে হাতে আম নেয় ছুটি আষাঢ়ের মাঝামাঝি
কানাচে কোমল চারায় হর্ষে আম নাম ওঠে বাজি।
আম শেষে গাছে নব কিসলয় রক্তিম শোভা ধরে
রসনা তৃপ্তি সাধিয়া আম্র নয়ন তৃপ্ত করে।

আম কি কেবল গাছেই ধরেগো আম কি শুধুই ফল ?
আম যে মোদের স্মৃতির ফলকে সদা করে ঝল্‌মল !

বাঁশ

আমার জন্মক্ষণে
পল্লীর ধাই পরিচয় মোর করা'ল বাঁশের সনে।
বয়স বছর তিন
হাতে নিয়ে ছোট কঞ্চির লাঠি বুড়ো সাজি সারাদিন।
বাঁশের নড়িটি হাতে
হাঁটা শিখে ছুটি সারা আঙিনায় নালকী বাছুর সাথে।
কিছু বড় হ'লে পর
কঞ্চি কাটিয়া করি ডাংগুলি—ছিপ করি মনোহর।
কাটি বাঁশ-ডগা দুটি
লম্বা ঠ্যাঙায় চড়িয়া পাড়ায় বেড়াই কখনো ছুটি।
বাঁশের মাচায় থাকি
ঠক্‌ঠকি রবে বোরো ধানক্ষেতে তাড়াই বাবুই পাখী।
আষাঢ়ে বাঁশের কোঁড়া
ওঠে তাড়াতাড়ি সারা গায়ে যেন রঙিন চাদর মোড়া।
পরে শীতকাল এলে
পোহাই সকালে কোঁড়া হ'তে ঝরা খোলায় আগুন জ্বেলে
গ্রীষ্মের রাতে ঝাড়ে
কড় কড় ধ্বনি শুনে মনে হয় ভূতে বুঝি বাঁশ ফাঁড়ে।

একেবারে অনাদরে
গরীবের সখা বাঁশঝাড় বাড়ে বাংলার ঘরে ঘরে।
কাটিয়া ঝাড়ের বাঁশ
মঞ্চ বাঁধিয়া বাপ পিতামহে লইয়াছি নদী পাশ।
ঝাড়তলে আজ এসে
কত দিবসের কত স্মৃতি ওঠে চোখের সামনে ভেসে।

বাস্তুভিটা

আমি যে গাঁয়ের ছেলে
আমি কি কখনো যেতে পারি দূরে পৈতৃক ভিটা ফেলে ?
এ ভিটার ধূলি মাঝে
কত অতীতের ব্যথা-বেদনার স্পন্দন আজো বাজে।
এর তৃণ তরুলতা
জানে এ বাড়ির প্রতিটি ক্ষুদ্র সুখের দুখের কথা।
ইহার তুলসী তলে
জননীরা নিতি স্মরেছে দেবতা যুগে যুগে আঁখিজলে।
প্রথম দিনের আলো
আমার চক্ষে আশীষ চুমায় বেসেছিল হেথা ভালো।
এই স্বরগের সুধা
মায়ের অসীম স্নেহের ধারায় মিটাল প্রথম ক্ষুধা।
আকাশের চাঁদ তারা
মোর সাথে হেথা পাতালো মিতালি মেঘ বায়ু বারিধারা।
কি আবেগ-ভরা সুখে
চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল হিয়া যবে কথা ফোটে মুখে।
গ্রীষ্ম বর্ষা শীতে
মুগ্ধ হইল চিত্ত হেথায় কত ছবি কত গীতে।

বাস্তুভিটা

এই উঠানের পাশে
মা বাবার সেই শেষ ছবি মোর এখনো নয়নে ভাসে।
মহাকাল পলে পলে
কত প্রিয়মুখ পূত অনুভূতি ডুবায় স্মৃতির তলে।
মায়ার মুকুর সম
এ-ভিটার বুকে চির-অম্লান জীবনের স্মৃতি মম।

বেত

প্রপিতামহের আমলের বেত ঝাড়
এখনো সমানে চলেছে তাহার বাড়
শিশিরে রৌদ্রে ঝিক্‌মিক করে পাতা
কি জানি কি বলে সারাবেলা নেড়ে মাথা।
আঙুর ছড়ার মত পাকা বেত ফল
গরমের কালে ঝাড়ে করে ঝল্‌মল।
দারুণ শিষের আঁচড় সহ্য ক'রে
মজা ক'রে খাই আনিয়া কোঁচড় ভ'রে।
নদীর পাড়ির কোটরেতে দিয়ে হানা
বেত শিষে ধরে ছেলেরা শালিক ছানা।
আমের গাছের সঙ্গে পাল্লা ধ'রে
কাবু করে তারে মাথার উপরে চ'ড়ে।
মাঝে মাঝে সেই বড় বড় বেত কেটে
'ভুলে' বেঁধে রাখি শিষপাতা আগে ছেঁটে।
কাঁচা ঘরে লাগে ছাঁটন আঁটন যত
বেড়ার বাঁধন ও বাঁধি বেতে মনোমত।
বেতের সাজিতে মুড়ি খাই ছেলেবেলা
বেতের ঢোলক পিটে পিটে করি খেলা।

বেতের তৈরী ঝাঁপি ধামা কাঠা আড়ি
নানা কাজে খাটে বাঙালীর বাড়িবাড়ি
বেতাগসিদ্ধ মুখের অরুচি হরে
বেত-ডগা-বড়া রসনা তৃপ্ত করে।
বেতের মোড়ায় বুড়োকালে ব'সে রই
গরীব চাষীর এমন বন্ধু কই ?

মাছ

মাছ ত কেবল জলেই করে না খেলা
খেলে বাঙালীর স্মৃতি মাঝে সারাবেলা।
মাছ ভাতে বাড়ে বাঙালীর গায়ে বল
তাই তাজা মাছ দেখে আসে জিভে জল
ডান্‌কানা পুঁটি মাগুর রোহিত টাঁই
সবই লাগে মিঠে অরুচি কিছুতে নাই।
গরমের দিনে প্রথম ঢলের পরে
ডিমভরা কই কানে হেঁটে মাঠে চরে।
ধানকাটা শেষে আমনের ক্ষেতে গেলে
খই ফোটে যেন টাকি কই পুঁটি বেলে।
বন্যার জল ধানক্ষেতে যবে ওঠে
বোয়াল নওলা লাখে লাখে এসে জোটে
শরতে মাঠের জল নেমে যেতে থাকে
স্রোতের সঙ্গে মাছ চলে ঝাঁকে ঝাঁকে।
গরীব চাষীর নগদ পয়সা কোথা ?
কাজ ফাঁকে ফাঁকে মাছ ধরি হেথা হোথা
বাংলার গাঁয়ে কোল বিল নালা নদী
নানা রকমের মাছে ভরা নিরবধি।

খেবলা বেশাল দোঁড়াজাল আছে আরো
বড়শি দুয়াড়ী হোঁচা পলো জুতি চারো—
রেখেছি সকলি—যখন যাহাতে পারি
যত পাই মাছ ধ'রে নিয়ে ফিরি বাড়ি।
নিজেদের মত রাখিয়া যা থাকে বাকি
বিলাইয়া দিই পাড়াপড়সীরে ডাকি।

পাট

পাট কারবারে বিদেশী বণিক পায় টাকা লাখে লাখ
বাংলার চাষী হা-ভাতে আমরা খাই শুধু পাটশাক।
পাটের প্রতিটি আঁশের সঙ্গে জড়িত কত-না আশা
কেমনে প্রকাশি মূক চাষী মোরা নাহি মুখে কোনো ভাষা
নীল চাষী দুখে এসেছিল জল সহুরে বাবুর চোখে
পাট-চাষী দুখে পাট-দর্পণ লিখিল না কোন লোকে।

গাঁতির মাঝারে সেরা জমি বেছে ফেলে গোবরের সার
কত চাষ দিয়ে পাট করি মাটি অবধি নাহিক তার।
তোষা পাট বীজ বুনি চৈত মাসে প্রথম বৃষ্টি পেয়ে
মোটামাটি দেখে বুনি 'গুটিপাট' চারা ওঠে ক্ষেত ছেয়ে।
নাঙ্‌লে সারিয়া নিড়াইয়া দিই ছোট ছোট চারাগুলি
দেখি সারাদিন সূর্য্যের পানে রহে তারা মুখ তুলি।
দুই তিনবার নিড়াবার পর এক বুক উঁচু গাছ
উখোশুখো পেলে আষাঢ়ের শেষে হ'য়ে ওঠে হাত পাঁচ।
জলে ডোবা ভয় থাকিলে তখনি কাটিয়া ফেলিতে হয়
ডাঙার জমিতে ভাদ্রমাসেও পাট ভুঁয়ে খাড়া রয়।

হেঁসোতে কাটিয়া গোছ গোছ গাছ ভুঁয়ে গাদা ক'রে রাখি
কবরের মত লম্বা গাদাতে ডগাগুলি রহে ঢাকি।
কয়দিন পরে আঁটি ক'রে বাঁধি পাতা ঝরা হ'লে শেষ
জলে ফেলি আঁটি—পাট মুথাগুলি পায়ে বিঁধে দেয় ক্লেশ।
একে একে আঁটি কঞ্চিতে গাঁথি মাটির চাওড় দিয়া
ডুবাইয়া রাখি—জাগ এল কিনা দেখি মাঝে মাঝে গিয়া।
জাগ এসে গেলে লোকজন নিয়ে নামিয়া কোমর জলে
বের ক'রে আটি মাঝমাঝি ভাঙি—হাতার আঘাত বলে
আলগা করিয়া গোড়ার অংশ ফেলি কাঠিগুলি টানি
বাড়ি দিয়া শেষে অপর অংশ গোছ ক'রে হাতে আনি।
দু'হাতে ঝাঁকিয়া জলের মধ্যে দূর করি পাট কাঠি
ছালোট ছাড়ায়ে গাদা ক'রে রাখি—ধুয়ে পাট পরিপাটি।
বড় চুলকায় যেথা বসে গায় ছোট ছোট বেঁড়ে পোক
জলের উপরে মশা কামড়ায় নীচে কাটে মোষে জোঁক।
পচা জলে রহি সারাদিনমান এইভাবে পাট ধুই
কখনো বা কেঁপে আসে ম্যালেরিয়া বিছানাতে গিয়া শুই।
ধোওয়া ভিজে পাট বাড়ী নিয়ে গিয়ে আড়ের উপরে মেলি
ডগা শুকাইলে গোড়া রোদে দিয়ে—ডগা ঝুঁটি বেঁধে ফেলি।

চাহিদা থাকিলে বেপারীরা এসে আড় হ'তে পাট ধরে
বছর খারাপ নির্জলা পাট রাখি গাদা ক'রে ঘরে।

পূজা এসে গেল—হাতে টাকা নাই, না দেখে উপায় আর
এক বোঝা পাট মাথায় লইয়া চলি হাটে বেচিবার।
জলের মূল্যে এক মণ পাট বেচে তিন টাকা পাই
কোন মতে মোটা ধুতি শাড়ী কিনে সাঁঝে বাড়ি ফিরে যাই।
খাজনার লাগি পেয়াদা তাগিদ দেয় রোজ রোজ আসি'
নালিশ করিবে ব'লে মহাজন যায় মাঝে মাঝে শাসি'।
বেপারী আসিয়া কখনো কখনো পাটের যে দর বলে
নিড়ানো খরচা পোষায় না তায়—ভেবে চোখ ভরে জলে।

পাট কারবারে বিদেশী বণিক পায় টাকা লাখে লাখ
বাংলার চাষী হা-ভাতে আমরা খাই শুধু পাটশাক।

বঁড়শিতে মাছ ধরা

ভাল লাল কেঁচো সন্ধ্যায় তুলে রেখে
বড়শি খালুই নিয়ে বন্ধুরে ডেকে
'পিয়েলি গাড়ী'তে গেলাম ধরিতে মাছ
দেখিতে দেখিতে সাথী জোটে জন পাঁচ।
ছিপ ফেলি ব'সে পাট খড়ি গাদা 'পরে
টুপ্‌টাপ কই টাকি জলে খেলা করে।
বড় উৎপাত করে ছোট চেলা পুঁটি
গেলে নাক টোপ ঠোক্‌রায় সবে জুটি'।
ফাতনার পাশে টাকি মাছ ভেসে উঠে
বুদ্‌বুদ ছেড়ে জল মাঝে যায় ছুটে।
নিমেষে ফাতনা ডুবিল দিলাম টান
দেখি বড় কই গিলেছে বড়শি খান।
মাছটি ছাড়ায়ে ফেলি ফের টোপ গাঁথি
উঠিল এবার আগের কই-এর সাথী।
পাবদা টেংরা টাকি কই ক্রমে ধ'রে
বোয়াল ফলিতে উঠিল খালুই ভ'রে।
মাছ লয়ে বাড়ি ফিরি দুপুরের আগে
সে-দিনের কথা আজো মনে বেশ জাগে।

মাষকলাই

বর্ষা গিয়াছে চলি
চরের জমিতে মাখনের মত পড়েছে নরম পলি।
ভাদ্রের মাঝামাঝি
মাষকলায়ের বীজ লয়ে মাঠে ছড়াই ভরিয়া সাজি।
একমাস নাহি যেতে
সতেজ সবুজ চারা ডাল মেলে ছেয়ে যায় সারা ক্ষেতে।
কার্ত্তিক শেষ ভাগে
ছোট ছোট পীত ফুলগুলি দেখে বড় আনন্দ লাগে।
শীত প'ড়ে এল বড়
আধমরা গাছ হেঁসোতে কাটিয়া সারি সারি করি জড়।
কলাই যখন কাটি
গাছগুলি করে ঝন্‌ঝন পায়ে মচ্‌মচ করে মাটি।
শুকালে ক্ষেতের মাঝে
খোলায় আনিয়া পালা ক'রে রাখি রোদ প'ড়ে এলে সাঁঝে
পাঁজালিওয়ালা এলে
কদমা মুড়কি তিলেখাজা লই কলাই ক'পাঁজা ফেলে।
ছুপুরে মাড়াই ক'রে
উত্তুরে শীত ঝাপটা হাওয়ায় উড়াই কুলোতে ধ'রে।

দানাগুলি জমে কাছে
ভুষি জমে দূরে ধূলি আরো দূরে রোদের কিরণে নাচে।
কলাই, ভুষিতে গাড়ী
বোঝাই করিয়া সন্ধ্যার পরে মাঠ ভেঙে ফিরি বাড়ি।
ছেলে মেয়ে ছুটে এসে
হাত হ'তে মোর মুড়কি কদমা তিলেখাজা লয় হেসে।

গরুর গাড়ী

উঠানে মোদের রহিত গো গাড়ীখানি
চড়িতাম কভু করিতাম টানাটানি
যবে সবে পিছে চড়ি
উলা হ'য়ে গাড়ী পড়াতে আমরা
যেতাম মাটিতে পড়ি।

গোবরের সার ভুঁয়ে ফেলিবার তরে
চোত মাসে খাঁচা বাঁধা হ'ত গাড়ী 'পরে
তুল্‌তুলে কালো সার
বোঝাই করিয়া গাড়ীখানি মাঠে
যায় দিনে কতবার।

নরম সারের উপরে আরামে ব'সে
রহিতাম আমি খাঁচাড় ধরিয়া ক'সে
চষা-ভুঁই দিয়ে পাড়ি
খালি গাড়ি নিয়ে গরু ছোটে বাড়ি
নেচে নেচে ওঠে গাড়ী।

বতরে দূরের মাঠের সোনালী ধানে—
ভরা গাড়ীখানি চলে ধীরে বাড়ি পানে
ব'সে ব'সে তার পরে
ধানের শিষের গাঁথিতাম মালা
কত-না যতন ভরে।

পোষ মাসে মাষকলাই মাড়াই ক'রে
খোলেতে কলাই জালে ভুষিগুলি ভ'রে
গাড়ি যবে চলে বাড়ি
ভুষির উপরে রহিতাম ব'সে
আরাম লাগিত ভারী।

মাঠ হ'তে এনে গাড়ী গাড়ী পাকা ছোলা
ভরিয়া ফেলিত যবে চৈতালী-খোলা
বোঝাই গাড়ীতে চ'ড়ে
ঝাঁকুনির সাথে কাঁচা ফল বেছে
খাইতাম মজা ক'রে।

খালি গাড়ী নিয়ে ভাড়া-খাটা গাড়োয়ান
ফাঁকা পথে যেতে ধরে মনসুখে গান
আমরা গরীব চাষী
গাড়ী নিয়ে খেটে হ'য়ে যাই সারা
কোথা পাব গান, হাসি ?

আখ মাড়াই

শীতের সন্ধ্যা মোর
আখের খোলার কত স্মৃতি নিয়ে আজো হ'য়ে আছ ভোর
যাদেরি প্রথম পালা
সাঁঝের বেলায় গুড়ের মুড়কি বিতরে ভরিয়া ডালা।
নতুন গুড়ের স্বাদ
গাঁয়ের সকল ছেলেবুড়ো মানে দেবতার পরসাদ।
বড় আখ নিয়ে কাঁধে
সিন্নি-মুড়কি কোঁচড়ে বাঁধিয়া বাড়ি ফিরি সাঁঝ বাদে।
কখনো সকালে গিয়ে
দেখি কলকল আখরস পড়ে বেলচার ফাঁক দিয়ে।
গরু চলে জোরে যত
বড় বড় আখ নিমিষে ফুরায় রসধারা বাড়ে তত।
একঘটি রস খেয়ে
বা'নের পার্শ্বে রস জ্বাল দেওয়া দেখি অনিমেষ চেয়ে।
দাদা জোরে দেন জ্বাল
আখের শুকনো ছোবড়া ছিটায়ে—ছাই গাদাতক লাল।
গুড় এলে ঘন হ'য়ে
অরহর গাছে উলটি আগুন দেন জ্বাল র'য়ে র'য়ে।

আট জালা দুই সারে
বয়াতি বসিয়া নাড়াচাড়া করে হাতা দিয়ে বারে বারে।
ডাহিনের চারি জালা
কিছু জ্বাল দিয়ে গাদ কেটে রস বামে আনিবার পালা।
বা'নের মুখের পাশে
বাম চারি জালা বেশী তাপ পেয়ে ঘন হয়ে ত্বরা আসে।
প্রথমে মসুরী ফোট
ক্রমে বড় ফোট সব শেষে মজা দেখিতে বাঘার চোট।
টগবগ ক'রে ফোটে
লাগিলে গাত্রে নিস্তার নাই—পুড়িয়া ফোস্কা ওঠে।
বয়াতি সুকৌশলে
অবিরাম নেড়ে ধরা নিবারিয়া তাক মত গুড় তোলে।
মাটির মস্ত চাড়ি
তার মাঝে সারাদিন গুড় রেখে পরদিন আনি বাড়ি।
দানাসহ গুড় তুলি
হাঁড়া হাঁড়া ক'রে বাঁকে ব'য়ে এনে ভরি বড় জালাগুলি।
শেষ পালা এলে পরে
হাঁড়া ভ'রে গুড় পৃথক করিয়া রাখি খোরাকের তরে।
গুড়ে পায়েস পিঠে
গরীব মোদের মুখে লাগে যেন অমৃতের মত মিঠে।

শীতের সকাল

পল্লীর ছেলে আমি
শীতের সকাল কত স্মৃতি নিয়ে মোর কাছে আসে নামি
ভোরে তাড়াতাড়ি উঠে
শিশির-সিক্ত সরিষা ক্ষেতের আ'লপথ পরে ছুটে—
নিত্য দাদার সনে
খেজুর গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দেখিতাম একমনে
কেমন সুকৌশলে
রসে ভরা হাঁড়ি কোমরে বাঁধিয়া আনিতেন গাছতলে।
আমার আছিল জানা
কোন্ রস মিঠে কোন্‌টি লোন্‌টা কোন্‌টি বা খেতে মানা
হ'লে আট দশ হাঁড়ি
দাদার বাঁকের পিছনে পিছনে ছুটে আসিতাম বাড়ি।
গামছা গেলাস এনে
সাজ রস ছেঁকে ভরপেট খেয়ে চাদর দিতাম টেনে।
যাইত না শীত তবু
উনানের পাশে বসিয়া আগুন পোহাতাম সুখে কভু।
খুব বেশী শীত পেলে
রহিতাম ব'সে আরামে আমের পাতায় আগুন জ্বেলে।

কভু গুড় মুড়ি নিয়ে
ভাইবোনে মিলে খাইতাম মোরা রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে।
ভাইটিরে সাথে ক'রে
মটরের শুঁটি তুলিতাম মাঠে হরষে কোঁচড় ভ'রে।
পাশের সরিষাক্ষেতে
সোনালী রঙের বান ডেকে যেত মৌমাছি যেত মেতে।
দূরের ক্ষেতের তিসি
অপরূপ নীল ফুলসম্ভারে যেত দিগন্তে মিশি।
উঠানের চারিপাশে
দেখিতাম ভোরে গাঁদাফুলগুলি জল-ভরা চোখে হাসে।
ধীরে ধীরে রোদ যবে
গোশালার চাল হইতে নামিয়া উঠানে পড়িত সবে—
গাভীটিরে রোদে আনি
দুধ-ভাঁড় ল'য়ে ছাড়িতে বাছুর জুড়ে দিত টানাটানি।
পানান হইলে শেষ
সজোরে বাছুর রহিতাম ধ'রে গাভীটি চাটিত কেশ।
বাবা দুহিতেন গাই
রূপালী সুধায় পাত্র ভরিত আজো চোখে ভাসে তাই।

কোলের মাছ ধরা

কয়দিন হ'তে কাছাকাছি গাঁয়ে গুজব রটেছে জোর
'শালদা'র কোলে নামিবে বাহুত ক'রে খুব তোড়জোড়।
পুষুড়ের দিন সকাল হইতে হৈ হৈ ধ্বনি ওঠে
জাল পলো কাঁধে শীতে ঠক্ঠক দলে দলে লোক ছোটে।

বড়দা ছোড়দা লন দোঁড়াজাল আমি লই পলো হাতে
বেশাল জালটি স্কন্ধে চাকর চলে আমাদের সাথে।

আগে নামে দোঁড়া তার পরে পলো বেশাল পিছনে চলে
টান দিতে দোঁড়া নওলা কাতলা খই ফোটে যেন জলে।

এড়াইয়া দোঁড়া পড়িছে পলোতে বেশালে কোনটি পড়ে
খপ্খপ ক'রে পলো ফেলি থেকে থেকে খল্বল নড়ে—

পলোর ভিতরে হাতড়িয়ে ধ'রে হালিতে গাঁথিয়া রাখি
মাছ বেশী পড়া দেখিলে সকলে হুঙ্কারে থাকি থাকি।

কিছু কাল বাহি হ'লে থলে ভারী বেশালীরা ছোটে বাড়ি
ক্রমে ক্রমে পলো দোঁড়াটানা লোক উঠে আসে তাড়াতাড়ি
জাল নিয়ে কোলে যারা গিয়েছিল সবাই পেয়েছে কিছু
খালি পলো হাতে ফেরে কেহ বাড়ি মনোদুখে মাথা নীচু।

দোঁড়া ও পলোতে ধরেছি বোয়াল মৃগেল নওলা ফলি
হাত্তকে কাতলা দুটি বাদে আর গেছে দোঁড়া ছিঁড়ে চলি।
বাটা পুঁটি আর খলসে খয়রা বেশালে পড়েছে চেলা
কোলের মাছের গল্পে ক'দিন কাটে অবসর বেলা।

খেয়াঘাট

পল্লীর খেয়াঘাটে
আসিলে দিব্যি আরামে সময় কাটে।
যে-গাঁয়ে যা-কিছু ঘটে
খেয়াঘাটে তাহা সকলের আগে রটে।
"এক নদী বিশ ক্রোশ"
তাই কালক্ষয়ে নাই হেথা আপসোস।
এই ছেড়ে গেল তীর
দেখিতে দেখিতে লাগিল লোকের ভিড়
ওপারে আজিকে হাট
দোকানী চলেছে লইয়া দোকান পাট।
ও পাড়ার কালো ভীম
ঝুড়ি ভ'রে লাউ এনেছে বেগুন সিম।
দাসেদের মধুকালা
খেজুরে পাটালি লইয়াছে ভ'রে ডালা।
পাড়ার মেহের আলী
ধান কিনিবারে লয়েছে বস্তা খালি।
মাঝের পাড়ার হরি
সোনামুগ নিয়ে চলেছে ধামাটি ভরি

মটর মসুরী রাই—
সরিষা ধামায়—খালি হাত বেশী নাই।
তথাপি সবারি মুখ
দেখে মনে হয় নাহি কারো মনে সুখ।

কুব্জা সারদা বুড়ী
পোঁটলা বগলে চলিয়াছে গুড়ি গুড়ি।
মেয়ে নাতি লাগি কুল
আমসি তেঁতুল বড়ি সিম বকফুল—
পোঁটলা লয়েছে ভ'রে
নাড়ু মুড়ি গুড় কত-না যত্ন ক'রে।

এ উহার খোঁজ লয়
অকপটে সবে দুঃখের কথা কয়।
নৌকা এপারে আসে
দেখিয়া সকলে দাঁড়াল জলের পাশে।
উঠে সবে তাড়াতাড়ি
মাঝিরে কহিল "দে ভাই শীঘ্র পাড়ি"।
সিকি নদী গেছে চ'লে
বাবু ধীরে এসে হাঁকিল 'ভিড়াও' ব'লে।
সময় বহিয়া যায়—
গরীব হাটুরে হাটবেলা নাহি পায়।

একান্ন চাষী

পাঁচ ভাই মোরা একপ্রাণ হ'য়ে একসাথে করি ঘর
আরামে আমরা কাটি কাল তাই না করি কাহারে ডর।
বড় ভাই চাষে খাটে নাক বেশী মোড়লের কাজ করে
সময় পেলেই নদী নালা হ'তে মাছ ধ'রে আনে ঘরে।
শিশুকাল হ'তে মেজ ভাই থাকে কেবল গো-পাল নিয়ে
সারাদিন করে গরুর যত্ন প্রাণের দরদ দিয়ে।
মোদের বলদ বুনানি সময়ে পড়ে না কখনো তাই
ভাঁড়ে ভাঁড়ে দুধ বারমাস দেয় মোদের দুধেল গাই।
অবসর কালে বাগানের কাজে মেতে থাকে সেজ ভাই
আমাদের ঘরে শাকসবজির তাইত অভাব নাই।
ছোট দুই ভাই একমনে শুধু চাষে খাটি বারমাস
আমাদের ভুঁই তক্‌তক করে না থাকে দুর্বাকাশ।
তাই পাশ এ'লে এক বিঘা ভুঁয়ে পাঁচ মণ ধান পেলে
বিঘা প্রতি সেথা মোরা দশ মণ ধান পাই অবহেলে।

একান্নে সুখে হরি মধু রাম আছিল, তিনটি ভাই
বুদ্ধির দোষে মেয়েলি কলহে হ'য়ে গেল ঠাঁই ঠাঁই।

ঘোর জ্বরে হরি বিছানা লইল পৃথক যেবার হ'ল
বুনানি সময় ব'য়ে গেল ক্রমে ক্ষেত সব প'ড়ে র'ল
বছরে বছরে বিবিধ ব্যারামে অতিশ্রমে হ'য়ে ক্ষীণ
দায়িক দেনাতে আকণ্ঠ ডুবে যাপে তারা ক্লেশে দিন।
হরিদের সেই সুখ-সংসার চোখের সামনে ভাসে
কষ্ট তাদের দেখে আজ মোর দুখে চোখে জল আসে।

মোরা পাঁচ ভাই একপ্রাণ হয়ে একসাথে বহি হাল
দুঃখ দৈন্য জানি না জীবনে সুখে কাটি চিরকাল।

চৈতালী

পাট আশুধান কাটা হ'য়ে গেলে মাঠে
বাংলার চাষী পুনঃ সারাদিন খাটে
বোনে চৈতালী যত
মটর মসুরী তিল তিসি ধ'নে
যব গম ছোলা কত।

ডাঙার জমিতে বোনে বীজ চাষ দিয়া
নাবাল জমিতে দেয় শুধু ছিটাইয়া
মাস দুই গেলে পরে
শিশির পুষ্ট সবুজ চারায়
নানারঙে ফুল ধরে।

আমাদের মাঠে প্রতি পোষ মাঘ মাসে
আকাশ হইতে রামধনু নেমে আসে
লাল নীল পীত ফুলে
শোভিত ক্ষেত্র নিরখি চিত্ত
নেচে নেচে ওঠে দুলে।

কালো তিল পরে সরিষা মটর পাকে
ক্রমে পাকে সব যব ছোলা বাকী থাকে।
চৈত্রের মাঝে মাঠ
রিক্ত রুক্ষ খাঁ খাঁ করে শুধু
হারায়ে সকল ঠাট।

সরিষা মসুরী যদি বেশী পাকে ভুঁয়ে
রোদে ছোটে বীজ হাত দিয়ে দিলে ছুঁয়ে
ডাকিতে ভোরের পাখী
শিরশিরে শীতে তুলিয়া ফসল
খোলাতে আনিয়া রাখি।

প্রথম চৈত্রে দুপুর রৌদ্র মাঝে
লেগে যাই মোরা চোতেলী মাড়াই কাজে
জোরে জোরে গরু তেড়ে
শেষ হয়ে গেলে মোটা ভুষিগুলি
রাখি পাশে ঝেড়ে ঝেড়ে।

জড় ক'রে শেষে উড়াই বাতাসে ধ'রে
সারা দেহ ওঠে ধূলোতে ভুষিতে ভ'রে
চক্‌চকে দানাগুলি
জমাট সাধনা ক'মাসের, মনে
বুলায় রঙিন তুলি।

সরিষা ভাঙানো

অমাবস্যায় বহি না আমরা হাল
কামারের বাড়ি দিয়াছি পোড়াতে ফাল।
ঘরে শুনি আজ রান্নার তেল নাই
ভাতে ভাত খেয়ে কলুর বাড়িতে যাই।
নতুন সরিষা লয়েছি ধামাটি ভ'রে
তেল-ভাঁড় পাট, টাকুটি সঙ্গে ক'রে
সামনের গাঁয়ে কলুর বাড়িতে উঠি
ঘা'ন শেষ হ'লে তবে তো আমার ছুটি।
ভাঁড় ভরে মোর এক ধামা সরিষায়
জানা আছে তবু রেখে আসা বড় দায়।
চোখের আড়াল হ'লেই কলের তেলে
ভাঁড় পুরে দেবে খাঁটি তেল রাখি' ঢেলে।
ঘুম পায় ঠায় ব'সে সারাদিন ধ'রে
তাই ত কোষ্টা এনেছি সঙ্গে ক'রে।
পৌঁছা মাত্র পিরু খুড়ো কাছে আসি
শুধায় কুশল মুখে এক গাল হাসি।
তেলচিটে চট পেতে দেয় দাওয়া পরে
বদনার জলে সরিষায় তাক করে।

দাঁতে ভেঙে বীজ তাক ঠিক ক'রে নেয়
ঠিক হ'লে নিয়ে ঘানির মধ্যে দেয়।

জাট লাগাইয়া গরু নিয়ে এসে জোড়ে
গলায় ঘণ্টা চোখ-বাঁধা গরু ঘোরে।

গ'ড়ে গেলে জা'ট নালি দিয়া তেল আসে
ভাঁড়ে এসে তেল জমা হয়—ফেনা ভাসে।

কাতারিতে ক্রমে ভার তুলে দেয় ক'সে
কলু মাঝে মাঝে গান ধরে ঘা'নে ব'সে।

দাওয়ার খুঁটিতে পাটগোছা বেঁধে রাখি
টাকুটি ঘুরায়ে কোষ্টা কাটিতে থাকি।

কাটিতে কাটিতে আধ সের দড়ি জমে
ওদিকে তেলের ধারা হয় সরু ক্রমে।

সরু ধারা শেষে ফোঁটা ফোঁটা তেল পড়ে
কলু এসে গরু খুলে লয় ক্ষণপরে।

উপরের খো'ল সহজে উঠিয়া আসে
শাবলে উঠায় যাহা থাকে জাট পাশে।

খো'ল একখানা রাখে কলু গরুতরে
গরম খইলে ধামাটি আমার ভরে।

ভাঙানো মূল্য লয় না নগদ কিছু
এক কাঠা ধান আনে কালে ঘা'ন পিছু

তেল ভাঁড় পাট টাকুটি ধামার পরে
মাথায় লইয়া—বেলা শেষে যাই ঘরে।
কলাই খিচুড়ী বেগুন পোড়ার সনে
সে-তেলের স্বাদ জানে শুধু চাষীজনে।

চড়ক

হলদে রঙের পাতাগুলি পড়ে ঝ'রে
ঝরা পাতা পায়ে ওঠে মচ্‌মচ ক'রে
শন্‌শন হাওয়া ছোটে
ও-পাড়ায় আজ চড়কের ঢাক
থেকে থেকে বেজে ওঠে।

বামুন শূদ্র গলাগলি ধ'রে চলে
ছোট বড় আজ সবে ভাই ভাই বলে
একসাথে ব'সে খায়
শিবদুর্গার কত মাহাত্ম্য
সমুচ্চ স্বরে গায়।

দারুময় চারু মূরতি মাথায় ক'রে
গাজনের দল ঘোরে গাঁয়ে গান ধ'রে
কাঁশি শিঙা ঢাক বাজে
তেলহীন স্নানে রুক্ষম চেহারা
তালে তালে সবে নাচে।

বেলা গ'ড়ে গেলে সারি সারি চলে স্নানে
নদীতট করে ধ্বনিত শিবের গানে
স্নান সমাপনে ফিরে—
দেবতারে পূজি উঠানে বসিয়া
খায় ফল ছাতু চিড়ে।

নীল পূজা সাঁঝে উৎসব বড় ভারী
ফলমূল ল'য়ে আসে কত নর-নারী
কেহ বা মানত রাখে
অভীষ্ট লাভে সামনে বছর
পূজা দেবে দেবতাকে।

সন্ন্যাসী মাঝে যাদের সাহস বেশী
ছোটে শ্মশানেতে সেই রাত শেষাশেষি
মড়ার চিহ্ন হাতে
হাজরা তলায় এসে উল্লাসে
নাচে পূজা দেয় প্রাতে।

সংক্রান্তিতে বিকালে চড়কতলে
জোটে পল্লীর ছেলেবুড়ো দলে দলে
সন্ন্যাসী একে একে
চড়কে উঠিয়া ঘোরে বনবন
ভিড় ক'রে লোকে দেখে।

গরীব গাঁয়ের জমাট দুঃখ নাশি
চড়কের সঙ ফোটায় ক্ষণিক হাসি
ছেলেরা বাজায় বাঁশি
খোকা গেছে ছেড়ে খেলনা দেখিয়া
অশ্রুতে আমি ভাসি।

কলেরা

রহিমের বাড়ি রাত্রির শেষে উঠিল কান্নারোল
দাসেদের বাড়ি দুপুরে আবার শুনি শুন হরিবোল।
বৈশাখ শেষ—এখনো এবার বৃষ্টির দেখা নাই
বাঙড়ের জল শুকায়ে চলেছে কাল এলো বুঝি তাই।
সন্ধ্যার পরে কীর্ত্তনদল ঘুরিছে লইয়া আলো
গাহিছে 'শমন হরি নামহীন দেশে তোর যাওয়া ভালো'।
মোল্লাপাড়ায় আসিয়া ফকির ধরিছে জিগির রাতে
থেকে থেকে সবে ওঠে হুঙ্কারি ফকিরের সাথে সাথে।
গণেশের বাড়ি বুড়োবুড়ী বাদে হ'ল একেবারে খালি
তাই ও-পাড়ায় বারোয়ারী তলে পূজিছে রক্ষাকালী।
আলোসিন্নির প্রসাদ বিতরি পতাকাযুক্ত বাঁশ
চাষীপাড়া মাঠে পুঁতিল সকলে বিঘ্ন করিতে নাশ।
গাহে একজোটে রৌদ্রে বসিয়া পবিত্র খোদা নাম
ভাবে একমনে অগতির গতি পুরাবে মনস্কাম।
ঠাকুমা'র কোলে শুয়ে থেকে রাতে সহসা চমকি' জাগি
শুনি সকরুণ কাঁদিছে বিধবা মৃত পুত্রের লাগি।
বহুদিন হ'ল থেমেছে কলেরা ঠাণ্ডা হয়েছে গ্রাম
সে-দিনের কথা স্মরিলে আজিও কেঁপে ওঠে মোর প্রাণ।

ধান বুনানি

কাল বৈশাখী নেমেছিল কাল সন্ধ্যার পুরোভাগে
তাই ত চাষীর চিত্তে আজিকে মহা উৎসাহ জাগে।
প্রথম মোরগ ডাকিবার আগে কৃষক গৃহিণী উঠি
তাড়াতাড়ি ক'রে রাঁধে ভাতে ভাত বেগুন পুড়ায়ে ছুটি
নাকে মুখে তাই গুঁজিয়া কৃষক বসিয়া পুত্র সাথে
হাল মই কাঁধে নড়ি-খানি হাতে বীজ ধান নিয়ে মাথে
দূর চর মাঠে যায় তাড়াতাড়ি গরু ছুটি চলে আগে
ভাত জল হুঁকা কল্কে আগুন ছেলে লয় আগে ভাগে।

বীজ ধান্যের কাঠা বাঁম কাঁখে ডান হাতে বীজ বোনে
শেষ হ'লে হাল জুড়িয়া ক্ষেত্র চষে চাষী একমনে।
মাঝে মাঝে ছেলে তামাক সাজিয়া নিজে গিয়া ধরে হাল
পিতা এসে ব'সে বাবলাতলায় হুঁকা টানে ক্ষণকাল।
বিশ্রাম শেষে হাল ধরে পুনঃ বক নাচে পিছে পিছে—
রোদ তেতে ওঠে ছায়া ছোট হ'য়ে পড়ে এসে পা'র নীচে।
দৈর্ঘ্যের চাষ শেষ হ'য়ে গেলে প্রস্থের দিকে চষে
দুফেরতা চাষ দেওয়া হয়ে গেলে গাছতলে খেতে বসে।

বেগুন পোড়ার সঙ্গে পেঁয়াজ লাগে আজ কত মিঠে
খালে গরু নিয়ে জল দেয় ছেলে কাপড় শুকায় পিঠে।

বাকসা, দুর্বা, কাশঅঙ্কুর শুকনো বাবলা ফল
ছায়ায় দাঁড়িয়ে দামড়া দুইটি খেয়ে নেয় ক'খাবল।

পিতার পাত্রে খাইয়া পুত্র যতনে তামাক সাজে
পিতা কিছুকাল হুঁকাটি টানিয়া মন দেয় নিজ কাজে।

লম্বে প্রস্থে দুই গড় মই দিতে যায় গ'ড়ে বেলা
তারপরে দোঁহে মন্থর পদে বাড়ি পানে দেয় মেলা।

রোজ রোজ কাটে এইমত কাজে যে কয়দিন যো' থাকে
নদীর চরের চিকন মাটিতে বোনে যাহা আগে পাকে।

তৃতীয় দিবসে প্রথম জমিতে মই দিয়া ফের আসে
সাত দিন পরে সারা ক্ষেতে চারা দেখে আনন্দে ভাসে।

দিন কুড়ি পরে ধানের চারাতে হয় দুই তিন পাতা
ঘাস চারাগুলি আস্তে আস্তে খাড়া ক'রে ওঠে মাথা।

ফের বৃষ্টিতে যো হ'লে যাওই দেয় ঐ ক্ষেতে ছেলে
নাঙ্‌লে দু'বার দিয়ে তারা যত ঘাস চারা মেরে ফেলে।

শ্যামা, বীঢ়কেনি দুর্বাভাদালে আউশ ক্ষেতের ঘাস
বড় তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠে করে ধানের সর্বনাশ।

সচ্ছল চাষী গোলাজাত ধানে নিড়ানো খরচা করে
গরীব চাষীরা গাঁতাতে নিড়ায় বেশী ধান কোথা ঘরে ?

ঘাসের গোছাটি বাঁ-হাতে ধরিয়া নিড়ানি চালায় ডানে
মাথাল মাথায় দশ বারজনে ধরে গীত একতানে।
বারমেসে গান রূপকথা গীতি মধু ঢালে যেন কাণে
মৃদুল বাতাসে ধানক্ষেতে ঢেউ চলে দিগন্ত পানে।

নতুন চরে জাল ধানের আবাদ

বার বৎসর আগে
পদ্মা নদীর ভীষণ ভাঙন আমাদের মাঠে লাগে।
ডাক দিলে কথা কয়
এমন সরেস দুটি দাগ মোর জলেতে হয়েছে লয়।
প্রতিটি বর্ষা গেলে
চর জাগে কিনা তীরে বসে দেখি তৃষিত নয়ন মেলে।
চেয়ে চেয়ে হয় মনে
বড় দাগে ব'সে ছোলা কাটিতেছি ফাগুনে বাবার সনে।
কভু চোখে ওঠে ভেসে
সিঁদুর কৌটা ধান পেকে ক্ষেত উঠিয়াছে যেন হেসে।
যত এক মনে চাই
গ্রীষ্ম বর্ষা শীতের মাঠের ছবিটি দেখিতে পাই।
সহসা চমক ভাঙে
কলের নৌকা ঘচঘচ রবে যেই এসে পড়ে গাঙে।
আশ্বিনে নদীকূলে
গিয়া দেখি দূরে ঠেকেছে নৌকা যেতে যেতে পাল তুলে।
শুনি কয়দিন পর
মোটে বালি নাই শুধুই পলিতে বেঁধেছে এবার চর।

চর যত জেগে ওঠে
তহশিলদার আমিন মুহরী এসে কাছারীতে জোটে।
জমি করা হ'লে বিলি
হালি চরে নেমে জলির আবাদ করি সব চাষী মিলি।
কূলে কোল পার হ'য়ে
কলার ভেওয়ায় চরে গিয়ে উঠি বীজ ধান চারা ল'য়ে।
দাঁড়ায় সাধ্য কার
থলথলে মাটি এক নিমিষেই লইবে অতলে তার।
ভর রেখে কলাগাছে
ছড়াইয়া বীজ লেপে দিই ভুঁয়ে—পায়রাতে খায় পাছে।
ধান লেপা হ'লে সারা
পিছু হ'টে এসে শুয়ে শুয়ে জলে রুয়ে দিই ধান চারা।
মাঘ শেষে রুয়ে আসি
বৈশাখ গেলে সোনালী শোভায় চরে ফুটে ওঠে হাসি।

দুয়াড়ীতে মাছ ধরা

পদ্মার তীরে বাস
দুয়াড়ীর মাছ খাই মোরা সুখে বৎসরে ছয় মাস :
এলে ফাল্গুন মাস
লম্বা পোরের লালচে পোক্ত কেটে আনি জাওয়া বাঁশ।
তুলে খিল ছোট বড়
চাঁছি অবসরে আনি দূর হ'তে শ্যামালতা ক'রে জড়।
খিলগুলি ভুঁয়ে পেতে
একটির পর আরেকটি খিল ধীরে ধীরে যাই গেঁথে।
লতাটি ঘুরায় ছেলে
বুনা শেষ হ'লে কাঁচা বাঁশ-চাকে খাড়া করি অবহেলে।
জুড়ে জিভ দুটি পার
পাস্তানি দিলে দুয়াড়ী তৈরী দেখিতে চমৎকার।
বানা বুনে বড়-বাঁশে
দু'দুয়াড়ী কাঁধে নগি বানা মাথে বিকালে জ্যৈষ্ঠ মাসে—
নদীর কিনারে যাই
আগে বানা মেলে সঙ্গে দুয়াড়ী পাতি পায়ে চিনে ঠাঁই।
উঠে চোখ মুছে ভোরে
খালুই লইয়া ছেলে সাথে ক'রে যাই মাঠ ভেঙে জোরে।

জলে নেমে দড়ি খুলি
জাগাতে ঢুয়াড়ী ছটছট ক'রে লাফায় চিংড়িগুলি।
ডাঙায় আনিয়া ঝাড়ি
আ'ড় কাঁটা বেলে চিংড়ি খালুই ভরে ছেলে তাড়াতাড়ি।
নদীর চিংড়ি সাথে
কাঁঠালের বীচি লকলকে ডাঁটা সুধা হ'ত মা'র হাতে।

আষাঢ়

এই ত সেদিন জ্যৈষ্ঠের শেষে রোদে গেছে মাঠ পুড়ে
আষাঢ় আসিতে কোথা হ'তে মেঘ জমিল আকাশ জুড়ে।
কুটরাজ গাছে সাদা সাদা ফুল ফুটিয়াছে থরে থরে
ভিজে মাটি 'পরে কদমের ফুল সারাদিন ধ'রে ঝরে।
দেখিতে দেখিতে উলুখড় ক্ষেত ছেয়ে গেল সাদা ফুলে
হালকা শুভ্র উড়নির মত উঠিছে বাতাসে দুলে।
মাঠের ওপার দক্ষিণ হতে কালো মেঘ উঠে আসে
ঝম্‌ঝম ক'রে খানিক বৃষ্টি—আবার রৌদ্র হাসে।
জ্যৈষ্ঠের খরা আধ মরা ক'রে ফেলেছিল ধান পাট
তামাটে ফ্যাকাশে রঙের বদলে সবুজ আজিকে মাঠ।
পাটচারা-ডগা হয়েছে সতেজ ধানচারা ঝাড় বাঁধে
খাওয়া নাওয়া ছেড়ে সারাদিন ধ'রে নিড়াই মনের সাধে।
মাঝে মাঝে ব'সে বাবলাতলায় আরামে তামাক খাই
হল্‌দে ছোট্ট বাবলা ফুলের মিষ্টি গন্ধ পাই।
নাবাল জমিতে আ'ল পাশে কাশ কল্‌মি যখন কাটি
থোকা থোকা সাদা শামুকের ডিম দেখি বড় পরিপাটি।
শশা চারাগুলি জল পেয়ে রঙ ধরেছে সবুজ কালো
জোনাকীর মত পীত ফুলগুলি দেখে লাগে ভারী ভালো।

শশার চারায় শামুকের ডিম দিতে গাছে বাড়ে বল
ডগায় ডগায় ধরে তাড়াতাড়ি কালো শুঁয়া-গায়ে ফল।
বেড়ার উপরে বিকাল বেলায় ঝিঙাফুল শত শত
ইল্‌শে গুড়োনি বৃষ্টিতে ভিজে শোভা ক'রে থাকে কত।
নিড়ায়ে ফিরিতে প'ড়ো ভিটা হ'তে কালো জাম পেড়ে আনি
ছেলে মেয়ে এসে কোঁচড় হইতে করে তাই টানাটানি।
বাড়ির সাম্‌নে কদমতলায় কালো গাই বাঁধা থাকে
ঘাস বোঝা আনি দেখে দূর থেকে হাম্বা হাম্বা ডাকে।
ডোবার ঘোলাটে জলের মধ্যে ছেলে মেয়েদের মেলা
সাঁতারে কেহ বা জল ছুড়ে ছুড়ে কেহ জুড়ে দেয় খেলা।
নাইতে নামিয়া দেখি নদী জল গিয়াছে ঘোলাটে হ'য়ে
মেয়েরা পিছল ঘাট বেয়ে ওঠে কক্ষে কলসী ল'য়ে।
নৌকার সারি শ্বেত পীত নীল লাল পাল তুলে যায়।
ছোট ছোট ঢেউ ভাঙে কল কল মাঝি সুখে সারী গায়।
ঘরের পিছনে ডোবায় হরষে সারারাত ডাকে ব্যাঙ্‌
কারো গলা ছোট ছাগলের মত কারো বা গ্যাঙর গ্যাঙ।
আম গাছ হ'তে খ'ড়ো চালে মোর টুপটাপ জল ঝরে
মাঠের সবুজ ছবি মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে আঁখি পরে।
মোরা চাষীলোক চাতকের মত আকাশের পানে চাই
মেঘ কি বস্তু মনে প্রাণে বুঝি বুঝাবার ভাষা নাই।

ইলিশ মাছ ধরা

(ছাকনা জালে)

শিলাইদহের গোরাই মজিয়া যেতে
গোপীনাথপুরে চন্দনা ওঠে মেতে
গেল বর্ষায় বউতি হয়েছে সবে
আষাঢ়ে এবার ভাঙে কূল ভীম রবে।
বড় পাড়ি সনে থোড় ধান হয় তল
নিরুপায় চাষী দেখে ফেলে আঁখি জল।
জল বাড়ে—পাড়ি সহসা বসিয়া যায়
ডুবে গেলে পাড়ি ফেনা ঘুরপাক খায়।
কোনোখানে ঘোনা—ঘূর্ণিতে ফেনা জড়
তারপরে ঠোঁটা—ধারের দাপট বড়।
মাঠ হ'তে ফিরে আষাঢ়ে সকলে জুটি
ডগাসহ কেটে ঝাড় সেরা বাঁশ দুটি
তৈরী করিয়া যত্নে ছাকনা বাঁশ
জাল গার্জন সাথে লই নদী পাশ।
ঠোঁটার স্রোতের মুখে গার্জন গাড়ি
জাল বাঁশ বাঁধি তার সাথে আড়াআড়ি।
কোল পাড়ি থেকে ফেলি জাল নদী জলে
চুল ছেঁড়া স্রোতে ভাটেনের পানে চলে।

কিনারে আসিলে উঁচু ক'রে বাঁশ তুলে
ফেরি জাল ফের উজানে নদীর কূলে।
ভারী জাল-বাঁশ টেনে বুক ব্যথা করে
সঙ্গীরা সবে পালা ক'রে এসে ধরে।
ব'সে ব'সে কেহ আরামে তামাক খায়
জাল উঠিলেই উৎসুক ভাবে চায়।
জাল আসে কূলে—ছল ছল ক'রে ওঠে
লাফ দিয়া সবে জালের নিকটে ছোটে।
মস্ত ইলিশ ধরিয়া ডাঙায় রাখি
আছড়ায় লেজ ছটফটে থাকি থাকি।
পাটের নতুন টাকার চাইতে শাদা
ধ'রে ধ'রে মাছ ভুঁয়ে ক'রে ফেলি গাদা।
ভাগ ক'রে মাছ ভোরে খুসী অন্তরে
বাড়ি ফিরে শুনি চাল বাড়ন্ত ঘরে।
হাঁড়ি কুঁড়ি খুঁজে ভুরো চাল দুটো পাই
তারি ভাত ভাজা মাছ দিয়ে সবে খাই।

বন্যায় বাংলা

শ্রাবণে এবার প্রবল বন্যা গ্রাসিল সর্বদেশ
তাইত ভাদরে দীন চাষী মোর দুখের নাহিক শেষ।
আধ পাকা ধান কাটিতে কাটিতে ডুবিল বানের জলে
ছেলে পিলে নিয়ে কি খাব ভাবিয়া ভাসি সদা আঁখি জলে
গুমো কটি ধান কয়দিন যাবে ব'সে ব'সে ভাবি তাই
এক আনা সুদে টাকা পাব ধার তাহারও উপায় নাই।
কি জানি কি লাগি ক'বছর হ'তে কেহই দেয় না ধার
গাঁয়ে মহাজন ছিল যারা তুলে দেছে ঋণী কারবার।
ভাতের অভাবে সকল গোষ্ঠী যদি ঘরে প'ড়ে মরি
কোনো মহাজন একটি টাকাও দিবে নাক দয়া করি।
জলে ভিজে ভিজে পাট কেটে জাগ দিয়ে ধুয়ে আনি ঘরে
খট্‌খটে ক'রে শুকায়ে রেখেছি বাঁশের মাচার পরে।
এমন কপাল মোটে দর নাই না আসে বেপারী গাঁয়
কিবা খাব আর কি দিয়ে শুধিব রাজার খাজনা হায়।
এমন বর্ষা জীবনে দেখিনি থই থই করে জল
কুমড়া লতাটি শুকাইল চালে ঝ'রে গেল কচি ফল।
লঙ্কা বেগুন শশা ঝিঙা পুঁই হ'য়ে গেল সব সারা
ম'রে গেল জলে বাবার লাগানো কাঁঠালের দুটি চারা।

ডিঙি নৌকায় সওদা করিতে মাঝে মাঝে যাই হাটে
দুখে ভরা মন পচা ধান চারা দেখে আমনের মাঠে।
শোবার ঘরের ধারি গেছে ধ'সে মেঝেতে পেতেছি মাচা
দিবস দুপুরে সাপ ঢোকে ঘরে মুস্কিল হ'ল বাঁচা।
ছোট ছেলে মেয়ে বোঝে নাক কিছু ঘরে রাখা বড় দায়
চোখে চোখে রাখি, উঠানের জলে তবু ছুটে নেমে যায়।
বড় ছেলেগুলি কলার ভেলায় মাটির চাড়িতে চ'ড়ে
জলে জলে ঘোরে পাড়ায় পাড়ায় সারাদিনমান ধ'রে।
রান্নাঘরের মেঝেতে ক'দিন হইতে ঢুকেছে জল
কোন মতে প্রাণ ধরিতেছি ক'রে চিড়ে গুড় সম্বল।
বুক জল মাঝে গরুগুলি আছে দাঁড়ায়ে গোয়াল ঘরে
করুণ চক্ষে চাহে চারি ধারে ডাকে সকরুণ স্বরে।
নিজেদের যত দুঃখ দৈন্য ভাবি নাক তত তায়
অবোলা প্রাণীর অসহ কষ্ট দেখে বুক ফেটে যায়।

গরীব চাষীর চোখের ঝরণা বাংলায় আনে বান
এ-কথা জগতে জানে নাক কেউ জানে শুধু ভগবান।

ধান কাটা (আউশ)

পশ্চিম মাঠে পড়িয়াছে জল রাত্রির শেষভাগে
তাই ত চাষীর চিত্তে আজিকে মহা আশঙ্কা জাগে।
নাব্‌লা বুনানি তারপরে এল শ্রাবণ প্রথমে বান
চাষীর কপালে লিখেছে এবার বহু দুখ ভগবান্।
কোনো ক্ষেতে আজো সবে দুধভর কোথা মাছরাঙা ধান
কি ক'রে আজি সে কাটিবে সেগুলি ভাবিতে ফাটে যে প্রাণ!
কাস্তে মাথাল হাতে নিয়ে চাষী অতি ভোরে উঠে ধায়
আট দশজন লোক সাথে ধান তাড়াতাড়ি কেটে যায়।
বেলা বেড়ে চলে—আধ হাঁটু জল কোমরের কাছে আসে
ধান আটিগুলি মাটি ছেড়ে ক্রমে জলের উপরে ভাসে।
বেশী জলে ছেড়ে পোয়ালের মায়া চলে শুধু শিষ কাটি
পরে সবে মিলে একটির সাথে বেঁধে যায় আর আটি।
বেলা প'ড়ে এলে ক্লান্ত শরীরে জলের ভিতরে টেনে
আটিগুলি রাখে ডাঙায় তুলিয়া বাড়ির ঘাটেতে এনে।
জল ঝ'রে গেলে আধ পাকা ধান মাড়াই করিতে থাকে
আরো কচি ধান উঠানের কোণে গাদা ক'রে চাষী রাখে।
দিন কয় পরে ধূমায়িত গাদা ভাঙিয়া মাড়াই করে
সবই বাজে চিটা গুমো ক'টি ধান দেখে চোখে জল ঝরে।

ঢেঁকি

সত্য খবর একি
চালকল এসে গ্রাম হ'তে সব উঠে যাবে নাকি ঢেঁকি ?
মা'র কোলে সুখে ব'সে
দেখেছি কেমনে ধান হ'তে তুষ যায় একে একে খ'সে।
পর্দাটি গেলে ঝ'রে
চকচকে চাল দেখিতে দেখিতে যায় সারা গড় ভ'রে।
ভিজাইয়া রেখে রাতে
ভেজে নিয়ে ধান জোরে পাড় দিয়ে চিড়ে ক'রে লয় প্রাতে।
নূতন ধান্য ওঠে
পাড়ায় পাড়ায় পাড়ের শব্দ—সব বাড়ি চিড়ে কোটে।
ভিজা যবগুলি তুলে
গড়ে ফেলে ধীরে পাড় দিতে দিতে যায় খোসাগুলি খুলে।
রৌদ্রে শুকায়ে নিয়ে
খোসা ঝেড়ে ফেলে দানাগুলি ভেজে ছাতু করে পাড় দিয়ে।
দিদির বিয়ের আগে
হলুদ কুটিতে ঢেঁকিশাল মাঝে মেয়েদের মেলা লাগে।
সবারি হাল্‌কা প্রাণ
দুইজন ক'রে পা দেয় ঢেঁকিতে ধরে তালে তালে গান।

দুঃখ দৈন্য মাঝে
বাঙালী মেয়েরা খুসী হ'য়ে ওঠে ঢেঁকিশালে গেলে কাজে।
ঢেঁকির সঙ্গে দুলে
তাহারি শব্দে প্রকাশি বেদনা যায় তারা দুখ ভুলে।
যুগে যুগে ঘরে ঘরে
কত ভাবে ঢেঁকি তুষেছে সবারে আজ তাই মনে পড়ে।

চাষীর স্বপ্ন

আঁধারের বুক চিরে চলে চির আলোকের অভিযান
দুঃখদগ্ধ জীবনে ইহাই সান্ত্বনা করে দান।
ম্যালেরিয়া জ্বরে কলেরা পীড়নে দৈন্যে শক্তিহীন
অগণ্য চাষী নগণ্য হ'য়ে রব আর কতদিন ?
রোদে তেতে পুড়ে জলে শীতে কেঁপে সাজাই অন্নথালা
সবে খায় সুখে মোরা শুধু সহি কঠোর জঠর জ্বালা।
জ্ঞানের বাতির তৈল জোগায়ে নিজেরা আঁধারে রব
নর-অধিকার বঞ্চিত প্রাণে যন্ত্রণা কত সব ?
সভ্যতালোক চাষীরা জগতে এনেছে সবার আগে
নব সভ্যতা মোরাই সৃজিব—এই আশা হৃদে জাগে।
নগর গড়িতে নরক সৃষ্টি করিব না তার সাথে
মৃত পল্লীর বুকে নব প্রাণ দিব নবযুগ প্রাতে।
সবল মনের দুর্দম তেজে লভি জ্ঞান অভিনব
চাষের কার্য্যে খাটাইব মোরা—অলস কভু না হব।
অনাবৃষ্টির অনল নিভাব ভোগবতী জলধারে
উষর ক্ষেত্রে ফলাব ফসল বাতাসে-তৈরী সারে।
তাজাঘাসেভরা গোচারণ ভূমি রহিবে সকল গাঁয়
গোধন সকল হবে ঘরে ঘরে হৃষ্টপুষ্ট কায়।

উর্বর ক্ষেতে সবল বলদে বহিব নিত্য হাল
বাঁধ বেঁধে মাঠে রোধিব প্লাবন—হব নাক নাজেহাল।
অন্ন বস্ত্র অভাব ঘুচিবে স্বল্প কায়িক শ্রমে
পরের হিংসা অপরের ক্ষতি করিবে না কেহ ভ্রমে।
বিজ্ঞান বলে ব্যাধি বীজ শত সমূলে করিয়া নাশ
মরতে রহিয়া করিব আমরা অমরের মত বাস।
উদরান্নের চিন্তা মুক্ত স্বাস্থ্যযুক্ত জন
নিতি নব জ্ঞান লাভের লাগিয়া সঁপিবে হৃদয় মন।
গবেষণাগৃহ পুস্তকাগার রহিবে সকল ঠাঁই
প্রয়োজন মত পাবে সকলেই যার যে তথ্য চাই।
ফুলে ফলে দুধে খাদ্য শস্যে ভরিবে সকল গেহ
খেয়ে খেয়ে মরা না খেয়ে মৃত্যু দেখিবে আর কেহ।
জ্ঞান অঞ্জনে সবার চক্ষে দিবে রঞ্জন ভাতি
মানুষে মানুষ চিনিবে ভুলিয়া তুচ্ছ সমাজ জাতি।

মহিমা মৌন যে তাজমহল কালের বক্ষে রাজে
সে-ও একদিন আছিল সুপ্ত মানুষের মনোমাঝে।
যে-বিরাট আশা স্বপ্নের মত উঁকি দেয় আজি মনে
কে-জানে কবে সে বাস্তবরূপে ধাঁধিবে বিশ্বজনে।

ম্যালেরিয়া

বর্ষার জল ঢোকেনি এবার গাঁয়ে
আশ্বিনে কোথা লাগে নাক কাদা পায়ে
তাই বুঝি ম্যালেরিয়া
বিষ-নিঃশ্বাসে সারাটি পল্লী
ফেলিল জর্জ্জরিয়া।

চাষীদের হাতে নাহিক এবার টাকা
পাট নিয়ামক সকল চেষ্টা ফাঁকা—
ঘরে ঘরে রোগী দল
জ্বরের প্রকোপে কেহ গান গায়
কেহ বলে জল জল।

যে বাড়ি য'জন সকলেই জ্বরে কাবু
কেবা দেয় জল কেবা রেঁধে দেয় সাবু
জুটেছে বিপদ ভারী
প্রচণ্ড জ্বরে মূর্চ্ছিত হ'য়ে
পড়িতেছে নর-নারী।

এইত সেদিন নবীনের ছোট মেয়ে
দু'দিনের জ্বরে মরিল মূর্চ্ছা পেয়ে
এখন গিয়াছে জানা
বেশী জ্বরে জল ' ঢালিবে মাথায়
না শুনে কাহারো মানা।

পোষ্টাফিসের কুইনাইনের বড়ি
সস্তা যদিও কিনিবার নাই কড়ি
ছেলে পিলে নিয়ে ঘরে
লঙ্ঘন দিয়ে পড়ে আছি তাই
জ্বর তাড়াবার তরে।

তীব্র তৃষ্ণা হাত পা ঠাণ্ডা হিম
সারা দেহ কাঁপে মুখ যেন তেতো নিম
যত লেপ কাঁথা ঘরে
সকলি চাপাই তবু শীতে কাঁপি
শেষে ছেলে চেপে ধরে।

ভাজা ভাজা করে সারাদিন জ্বরে ভোর
নেমে আসে ক্রমে রাত্রি যখন ভোর
কয়দিন এই মত
ছেড়ে গিয়ে জ্বর ফিরে আসে পুনঃ
শেষে হয় জ্বর গত।

উপসর্গের না থাকিলে বাড়াবাড়ি
গরীব আমরা যাই না বদ্যি বাড়ি।
ম্যালেরিয়া জ্বর ছাড়ে
ভাত খাই দুটো কাজ করি ধীরে
পিলে দিনে দিনে বাড়ে।

শীতের ক'মাস বড় ভয়ে ভয়ে থাকি
ঠাণ্ডা লাগিলে আসে জ্বর থাকি থাকি
কার্ত্তিকে জ্বরে প'ড়ে
চৈতালী বোনা হ'ল না ক্ষেত্র
রহিল পতিত প'ড়ে।

ধান কাটা (আমন)

ভাদুরে ফসল গেছে' নিস্ফল তাই বুঝি ভগবান
ছাপ্পড় ভেঙে আমন বতর চাষীরে ক'রেছে দান।
বর্ষা বৃষ্টি দুই-ই ভাল পেয়ে এবার মাঠের ধান
মোটা গোছা ক'রে ঝাড় বাঁধিয়াছে দেখিয়া জুড়ায় প্রাণ।
আশ্বিন শেষে ফুলিবার কালে বৃষ্টির জল পেয়ে
পুষ্ট দীর্ঘ শিষ ফেলে ধানে মাঠ ফেলিয়াছে ছেয়ে।
ভাওয়ালে হইতে কাঁকে দীঘে ধান সকলি ফলেছে ভালো
রাঙ্গাবাদাল ঝিঙাশোলে আজ অগ্রাণে মাঠ আলো।

ভাল দিন দেখে লোকজন নিয়ে ভাওয়ালে প্রথমে কাটি
খাড়া হুলধারী সাদা ধানগুলি বাড়ি আনে আটি আটি।
কয়দিন গেলে ভাঙা মাঠ থেকে কেটে আনে বাঁশীরাজ
পরে কয়দিন চাষীর বাড়িতে থাকে না বিশেষ কাজ।
দীঘে ধান বাদে আর সব ক্রমে এককালে পেকে ওঠে
ভাগে-ধান-কাটা গরীব জনেরা চাষীর বাড়িতে জোটে।
শীর্ণ চেহারা মাথাল মাথায় কাচি দড়ি নিয়ে হাতে
উঠানে বসিয়া হুঁকা টেনে প্রাতে চলে মাঠে এক সাথে।

মিষ্টি রৌদ্রে সামনে হেলিয়া রহি ছলছল জলে
শপ্‌শপ্‌ রবে দুপুর অবধি ধান কেটে তারা চলে।
থেকে থেকে চাষা হৃষ্ট চিত্তে চেয়ে রয় ক্ষেত পানে
সব আশা তার বেঁধেছে যে দানা আজিকে সোনালি ধানে।
ঝনঝন রবে বোঝা বোঝা ধান আঙিনাতে এনে রাখে
সন্ধ্যার আগে সকলে মিলিয়া মলন জুড়িতে থাকে।
মেওয়া গরু মাঝে রহি এক ঠাঁই অবিরাম খেয়ে চলে
সবার ডাইনে জোরালো দামড়া ঘোরে দুরন্ত বলে।
জনেরা বসিয়া চাঁদের আলোকে কোঁচাড় কাপড় গায়
সুখের দুখের কত কথা বলে কভু বা তামাক খায়।
মাঝে মাঝে দেয় কাঁদালিতে খড় ওলট পালট ক'রে
ধান ঝেড়ে ঝেড়ে খড় রাখে দূরে সব ধান গেলে ঝ'রে।
পাটসারে টেনে মাঝখানে এনে রা'শ ক'রে রাখে ধান
কাঠা দিয়া মেপে ছয় ভাগ রেখে এক ভাগ করে দান।
জনেরা সে-ভাগ বণ্টন করে লয় নিজেদের মাঝে
যতদিন ভুঁয়ে থাকে পাকা ধান কাটে এই মত কাজে।

ধারে খাওয়া ধান শুধি মহাজনে চাষীর হালকা প্রাণ
ভাতের ভাবনা কিছুদিন তরে হ'ল তার অবসান।
নরসুন্দর ছুতার মিস্ত্রী আসে ঘাটমাঝি প্রাতে
সারা বছরের পাওনা গণ্ডা শোধে চাষী মোটা হাতে।

গরীবের ঘরে কার্টিবা মাত্র নতুনের চাল খায়
নবান্ন ঘটা হাভাতে কৃষক বুঝিবে কি ক'রে হায়।
দারুণ দৈন্যে মিয়মান কাল কাটে বাংলার চাষী
শুধু এই ক'টি রঙ্গিন দিনে ফোটে তার মুখে হাসি।

গাঁয়ের ছবি

পদ্মার পারে ছায়াঘেরা গাঁয়ে আমার কুটিরখানি
জগতের মাঝে এই ঠাঁই আমি সবচেয়ে সেরা জানি।
ঊর্দ্ধ আকাশে 'চোখ গেল' পাখী ডেকে ডেকে হেথা মরে
ঘুম ভাঙে ভোরে অদেখা পাখীর 'বউ কথা কও' স্বরে।
আমের ডালের আড়াল হইতে কুহু কুহু মুহু আসে
নিঝুম পল্লী নিয়ত পাখীর সুরের প্লাবনে ভাসে
আম গাব লেবু বাবলা খেজুর ফুলের স্নিগ্ধ ঘ্রাণ
কামিনী বকুল গন্ধে আকুল ক'রে তোলে মোর প্রাণ।
প্রথম আষাঢ়ে কুটজ কদম হরষে মেঘেরে বরে,
শারদ ঊষায় আঙিনায় মোর শেফালির হাসি ঝরে।

গরমের কালে লিচু আম জাম জামরুল থরে থরে
বেল পেঁপে লেবু কলা আনারস আমার বাগানে ধরে।
পুকুরের পাড়ে নারিকেল শ্রেণী বহে শিরে বার মাস
লিমনেড-জিনি সুপেয় পানীয় কত সুমিষ্ট শাঁস।
বেগুন লঙ্কা পালং টম্যাটো কপি আলু করি চাষ
মাঝে মাঝে ঘরে ডিম পাড়ে মোর সুপুষ্ট পাতিহাঁস।

বরবটি লাউ পুঁই ঝিঙা শশা কুমড়া মাচায় ফলে
লক্ষ্মীর বাস আমার আবাসে তাই ত সকলে বলে।
পুকুরে আমার ফটিকের মত জল বার মাস থাকে
কাতলা রোহিত মৃগেল মৎস্য খেলা করে ঝাঁকে ঝাঁকে।
বিলের মাঠের কাঁকে ঝিঙাশোল ধানের মিষ্ট চাল
কত স্বাদিষ্ট দোঁয়াশ মাটির মাঘী মটরের ডাল।
কলাই মসুরী মুগ অরহর সরিষা জমিতে ফলে
রয়না রেড়ীর তৈলে আমার সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলে।
চিনির চাইতে সরেস খাইতে কাজলা আখের গুড়
আমার বাড়ির খেজুরে পাটালি সবচেয়ে সুমধুর।
ফেন ভুষি খেয়ে নধর কান্তি আমার শ্যামলী গাই
তাই ত জগতে তাহার দুধের তুলনা কোথাও নাই।
রোদে নুয়ে পড়া ধান ক্ষেত ছেড়ে তপ্ত বালির শেষে
তৃষিত যে-পথ পদ্মার শীত বক্ষে ছুটিয়া মেশে—
সে-পথে দুপুরে কর্ম ক্লান্ত শরীর টানিয়া আনি
তরত'রে জল স্নেহের পরশে মুছে দেয় জ্বালা গ্লানি।

হরিশ হবিব পাশ আ'লে মোরা এক মাঠে বহি হাল
ভাই ভাই সবে পল্লীর বুকে সুখে দুখে কাটি কাল।
একাসনে ব'সে রহমান চাচা রসিক কাকার সনে
কাজ শেষে সাঁঝে হুঁকা টানি মোরা নানারূপ আলাপনে।

কখন আমরা গাহি এক সাথে দেহতত্ত্বের গান
ভুলে যাই মোরা কেবা যে হিন্দু কেই বা মুসলমান।
বাংলার হেন গাঁয়ের আমার তুলনা কভু কি হয়
স্বর্গও বুঝি শান্তি সুষমা মণ্ডিত এত নয়।

পরিশিষ্ট

মধ্য বাংলার পদ্মাতীরবর্ত্তী কতকগুলি গ্রাম এই কবিতাগুলির পটভূমি। এই অঞ্চলের চাষীদের জীবনযাত্রার বা চাষের পদ্ধতির সঙ্গে বাংলাদেশের অন্যান্য অংশের কিছু প্রভেদ থাকিতে পারে—চাষবাস সংক্রান্ত প্রচলিত কথাগুলিও অনেকাংশে বিভিন্ন হইবার সম্ভাবনা। এইসব শব্দের কোন সাধারণ পরিভাষা না থাকাতে কবিতার গতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করা হইয়াছে :—

পৃষ্ঠা	শব্দ	অর্থ
৪	নালকী বাছুর	শিশু গো-বৎস
১১	খেবলা, বেশাল, দোঁড়া	বিভিন্ন প্রকারের জাল
১১	ছুয়াড়ী, হোঁচা, পলো, চারো	বাঁশের তৈরী মাছ ধরিবার যন্ত্র
১২	গাঁতি	সংবৎসরে চাষী যতটা জমি আবাদ করে।
১২	তোষাপাট	লাল্‌চে আভাযুক্ত উৎকৃষ্ট প্রকারের পাট।
১২	গুটিপাট	সাদা-আঁশ-যুক্ত পাট, ইহার ফল গোলাকার হয় বলিয়া সম্ভবতঃ এই নাম।
১৩	হেঁসো	কাস্তের মত ধারাল অস্ত্র বিশেষ

পৃষ্ঠা	শব্দ	অর্থ
১৬	পাঁজালিওয়ালা	যাহারা কাটা শুকনো কলাই গাছ লইয়া—পরিবর্ত্তে কদমা ইত্যাদি ফিরি করে।
১৬	পালা	গাদা
১৮	উলা হ'য়ে পড়া	গো-গাড়ীর সম্মুখদিক উঁচু হইয়া উঠা।
১৯	বতর	শস্য সংগ্রহের সময়
২০	বেলচা	আখমাড়াই কলের সিলিণ্ডার
২০	বা'ন	গুড় তৈরীর বড় উনান
২১	বয়াতি	গুড় তৈরী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি
২১	চাড়ি	মাটির তৈরী বড় গামলা
২২	সাজ রস	প্রথম কাটের রস
২৩	পানান	বাছুরে গাভীর বাঁট চাটিয়া দুধ নামান।
২৪	বাহুত	যাহারা দলবদ্ধ হইয়া এক-যোগে মাছ ধরে।
২৫	কোল	নদী মজিয়া গিয়া বদ্ধ জলাশয়
৩০	নাবাল	নীচু
৩৩	জা'ট	ঘানির মধ্যস্থ মুগুর, ইহার চাপে সরিষা ভাঙে।
৩৩	কাতারি	ঘানি সংলগ্ন প্রশস্ত তক্তা—ইহার উপর ভার চাপান হয়।

পৃষ্ঠা	শব্দ	অর্থ
৪০	যো	(বুনিবার) যোগ্য
৪০	দুই গড় মই	দুই ফেরতা মই
৪০	গাঁতা	পারিশ্রমিক না লইয়া পরস্পর কাজ করা।
৪০	যাওই দেওয়া	ধানের চারার উপরে পাতলা ভাবে মই দেওয়া—ইহার অব্যবহিত পরে নাঙলে নামক যন্ত্রদ্বারা মাটি আঁচড়াইয়া দেওয়া হয়, ফলে সদ্য উপ্ত ঘাসের চারা বিনষ্ট হয়।
৪২	দুটি দাগ	দুই খণ্ড (plot) জমি
৪৪	পার, পাত্তানি	বাঁশের খিলে তৈরী দুয়াড়ীর বিভিন্ন অংশ।
৪৮	বউতি	চলতি, বহমান্
৪৮	থোড়-ধান	শিষ বাহির হইবার আগের অবস্থার ধান।
৪৮	গার্জন	যে বাঁশটি পুঁতা হয়
৪৯	ভুরো	কাউন জাতীয় এক প্রকার খাদ্যশস্য।
৫০	গুমো	ভিজা অবস্থায় গাদা করিয়া রাখায় পচিয়া দুর্গন্ধযুক্ত।
৫২	নাবলা বুনানি	দেরীতে বুনা

পৃষ্ঠা	শব্দ	অর্থ
৫২	মাছ রাঙা	মাছরাঙা পাখীর রংঙের মত হলুদ ও সবুজে মিশানো— পাকিবার পূর্ব্বাবস্থার রং।
৫২	চিটা	দানাশূন্য ধান
৬০	দীঘে, ভাওয়ালে, রাঙ্গাবাদাল, ঝিঙাশোল	বিভিন্ন প্রকারের আমন ধান
৬১	মলন	মাড়াই করিবার জন্য বিছানো ধানগাছ।
৬১	মেওয়া গরু	মলনের মাঝখানের গরু
৬১	কাঁদালি	মাথায় ১টি মাত্র আলযুক্ত বাঁশের ডগা।
৬১	পাটসার	শস্য জড় করিবার জন্য কাঠ দিয়া তৈরী যন্ত্র।

শুদ্ধি পত্র

৪	পৃষ্ঠায়	শেষ	পংক্তিতে	ফাঁড়ে	স্থলে	ফাড়ে
১৮	,,	১২	,,	খাঁচাড়	,,	খাঁচাটি
৩২	,,	শেষ	,,	সরিষায়	,,	সরিষার
৪০	,,	১৭	,,	বাঁঢ়কেনি	,,	বাঁরকেনি
৫৬	,,	১২	,,	দেখিবে আর	,,	দেখিবে না আর
৬২	,,	৩	,,	মিয়ম্রান	,,	ম্রিয়মান

প্রথম সংস্করণের কয়েকটি অভিমত

মাটির মায়ার প্রথম সংস্করণের পরিচিতি প্রসঙ্গে কবিশেখর কালিদাস রায় মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—

"শ্রীমান্ হরগোপাল বিশ্বাস রসায়ন শাস্ত্রে অভিজ্ঞ। ইনি শারীর ও মানস, বাস্তব ও কাল্পনিক দুই শ্রেণীর রসায়নেরই অনুশীলন করেন। তাঁহার মানস রসায়নের অনুশীলনের ফল এই কবিতাগুলি।

কবিতাগুলি বাংলা মাটির খাঁটি ফসল। বাংলাদেশের পল্লীভূমির কতকগুলি চিত্র ও পল্লীজীবনের ছোটখাটো সুখ দুঃখের কথা লইয়া এই কবিতাগুলি রচিত।

......................এই কবিতাগুলিকে আমার চাঁদনী রাতে শোনা বাংলা মাঠের বাঁশীর সুরের মত মধুর লাগিল। আশা করি, কাব্যামোদী খাঁটী বাঙ্গালী পাঠকেরও এইগুলি ভালোই লাগিবে।"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার অধ্যাপক লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও কবি শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—

"আপনার পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ হইতেছে শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। আপনি অতিশয় সরল, সহজ ও পরিচ্ছন্ন ভাষায় বাংলার পল্লীকথা যেভাবে ছন্দে গাঁথিয়াছেন তাহাতে যে তথ্য, যে চিত্র এবং যে ভাব আছে তাহা নবীন ছাত্রগণের পক্ষে যেমন উপাদেয় তেমনি প্রয়োজনীয়। এ ধরণের রচনায় সত্যকার শিক্ষাদানের কাজ হইবে। এ জন্য আমি আপনাকে অন্তরের অভিনন্দন জানাইতেছি। আমি পূর্ব্বেও আপনাকে আমার এই অভিমতই জানাইয়াছি।"

সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় আই-সি-এস মহোদয় লিখিয়াছেন ঃ—

"আপনার মাটির মায়া বাংলা সাহিত্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠা দেবে। আমরা এতদিন আপনাকেই খুঁজছিলুম, কিন্তু এই একখানিতে আমাদের দাবী মিটবে না। আরো লিখুন, আরো বিচিত্রভাবে লিখুন।"

টেক্‌সট বুক কমিটির সেক্রেটারী শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব লিখিয়াছেন ঃ—

"বহু বৎসর পূর্বে "মৈমনসিংহ গীতিকা" প'ড়ে যে আনন্দ লাভ করেছিলাম "মাটির মায়া" আমাকে সেই আনন্দ দিয়েছে। মধ্য বাংলার পদ্মাতীরের ম্লান স্তিমিত প্রদেশ আপনার গভীর প্রেমে মুখর হয়েছে—তার ব্যথা ও বাণী দুয়েরই দূত হবার সৌভাগ্য আপনার হয়েছে। আপনার জয় হোক।"

রাজসাহী কলেজের ইংরাজী ভাষার অধ্যাপক সুপণ্ডিত ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—

"I have read the booklet (মাটির মায়া) and consider the poems good. They are unpretentious and have the charm of the open air about them. I recommend these poems to the reading public for their simplicity, freshness and touches of genuine tenderness."

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহোদয় লিখিয়াছেন ঃ—

"শ্রীমান হরগোপাল বিশ্বাস লেবরেটরীতে বসিয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেন। গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনা করেন ইহাই জানিতাম। কিন্তু শুষ্ক সাধনার অবসরে কখন যে তিনি কাব্যলক্ষ্মীর প্রসাদ লাভে সমর্থ হইয়াছেন তাহা জানিতাম না। তাই সহসা তাঁহার 'মাটির মায়া' আবিষ্কার করিয়া যুগপৎ বিস্মিত ও পুলকিত হইয়াছি।

বাংলার মাঠ ঘাট ফসল তার পল্লীজীবনের সুখদুঃখ আশা ও আশঙ্কার ছবি এমন মিষ্ট করিয়া ও দরদ দিয়া আঁকিতে পারা কম কৃতিত্বের কথা নহে।

পল্লীর কুটিরেই জাতির প্রকৃত আসন, আমার বিশ্বাস শ্রীমান হরগোপালের মাটির মায়া সেই পল্লীর সহিত পাঠক পাঠিকার নিবিড় পরিচয় ঘটাইতে সমর্থ।"

কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহোদয় লিখিয়াছেন ঃ—

"তোমার উপহৃত 'মাটির মায়ায়' এই বুড়া বয়সেও আবার বাঁধা পড়িয়া গেলাম। আমারা বিশ্বাস,—কাব্য কবিতা বা সৌন্দর্য্যের অধিকাংশই আমার বাল্যকালের পল্লীজীবন হইতে সঞ্চয় করিয়া মনের খাতায় জমা করিয়া রাখি এবং তাহাই ভাঙাইয়া বাকী জীবনের রসের রসদ সংগ্রহ করি। তোমার মাটির মায়া আমার সেই বিশ্বাসই দৃঢ় করিয়া দিল।

বইখানি পড়িতে পড়িতে অতীত জীবনের সেই মধুময় মুহূর্ত্তগুলি মনের মধ্যে আবার ফিরিয়া পাইলাম এবং নানা ঝঞ্ঝা ঝঞ্ঝাটে ভরা বর্ত্তমান জীবনের এই মরুময় বালুপথে যেন তৃষ্ণার জলের সন্ধান মিলিয়া গেল।"

'প্রবাসী'

"লেখকের গভীর অনুভূতি এবং অন্তদৃ'ষ্টি থাকায় পল্লীজীবনের সুখদুঃখের কথা এবং পল্লীভূমির আলেখ্যগুলি ও পল্লীবাসিগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সহজ পদ্ধতিগুলি আমাদের নিকট মনোজ্ঞ হইয়াছে। কবিতাগুলিতে সম্পূর্ণ বাস্তবে অনুভূত রসসৌন্দর্য্য আছে এবং মাঠের বাঁশীর সুরের স্বচ্ছন্দ স্ফুরণ হইয়াছে। কবিতাগুলির মধ্যে আম, বাঁশ, শীতের সকাল, চৈতালী, সরিষা ভাঙানো, ধান বুনানি, গাঁয়ের ছবি প্রভৃতি অতীব উপভোগ্য হইয়াছে। শীতের সকাল বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলিতেছেন—

পাশের সরিষা ক্ষেতে
সোনালি রঙের বান ডেকে যেত মৌমাছি যেত মেতে

আর এক স্থলে দেখিতে পাই—

আম কি কেবল গাছেই ধরে গো আম কি শুধুই ফল
আম যে মোদের স্মৃতির ফলকে সদা করে ঝলমল।

এই সব চিত্র বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ। এই সব সম্পদ লইয়া গ্রন্থকার বাঙালী মনকে পল্লীর পথে আমন্ত্রণ করিয়াছেন।"

শনিবারের চিঠি—

"রাসায়নিক কবি যে মাটিকে বিশ্লেষণ করিতে না বসিয়া মাটির মায়ায় মুগ্ধ হইয়াছেন, ইহা বিস্ময়ের ব্যাপার। এ মাটি শহরের নয়, পল্লীগ্রামের; কবিতাগুলি আমাদের শহুরে চোখে মায়ার অঞ্জন বুলাইয়া দেয়। শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় সত্যই বলিয়াছেন, এগুলি বাংলা মাটির খাঁটি ফসল। ছন্দ ও মিলের উপর কবির দখল অসাধারণ।"

আনন্দবাজার লিখিয়াছেন—

"গ্রন্থকারকে রসায়নশাস্ত্রে পণ্ডিত বলিয়াই জানিতাম। তিনি যে সুন্দর কবিতা লিখিতে পারেন এই গ্রন্থে তাহার পরিচয় পাইলাম। বস্তুতঃ পল্লীর স্মৃতি তাহার সুখদুঃখ হাসি অশ্রুর কথা এই সহজ সরল কবিতাগুলির মধ্য দিয়া প্রাণস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে। 'আম', 'বাঁশ', 'মাষকলাই', 'আখমাড়াই', 'পাট', খেয়াঘাট', 'চৈতালী', 'সরিষা ভাঙানো', 'ধানকাটা', 'মাছধরা', প্রভৃতি কবিতা পল্লীর কথাই আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়। আশা করি, কাব্যামোদী পাঠক মহলে এই গ্রন্থ সমাদর লাভ করিবে।"

'দেশ' বলেন,—

"কবিতাগুলি পল্লীভূমির কতকগুলি চিত্র ও পল্লীজীবনের ছোটখাটো সুখদুঃখের কথা লইয়া রচিত। লেখাগুলি আমাদের বেশ ভাল লাগিল, পল্লীজীবনের স্নিগ্ধ পরিবেশের মধ্যে মনকে এগুলি লইয়া যায় এবং পল্লীর সহিত প্রাণপরিচয়ের মধ্য দিয়া আনন্দের আস্বাদ লাভ হয়। দেশের জলবায়ু এবং মাটির সঙ্গে দরদ মাখাইয়া কবিতাগুলি লেখা। উচ্চস্তরের ভাবঘন সাহিত্যের পদবীতে কবিতাগুলি পড়ে না, আমরা কিন্তু মনে করি, উচ্চস্তরের ভাবঘন সাহিত্যের মর্য্যাদার মূল্যের চেয়ে কবিতাগুলিতে স্নেহ এবং দরদের যে দৃষ্টি রহিয়াছে, ইহার মূল্যও কম নয়। দেশের প্রাণ-রসের সম্পর্ক-বিচ্যুত ফাঁকা মর্য্যাদার চেয়ে এদেশের জল ও মাটির দরদমাখা এই কবিতাগুলিতে তাই আমরা মিষ্টতা পাইয়াছি। আশা করি, পাঠক পাঠিকারা কবিতাগুলিতে বাঙলার পল্লীজীবনের আত্মীয়তার স্নেহস্পর্শটিকে লাভ করিবেন এবং প্রত্যক্ষ ভাবে পাইবেন একটু প্রাণে প্রাণে বাঙলা মায়ের আপ্যায়ন। বর্ত্তমান সাহিত্যে, বিশেষত আধুনিক কবিতায় অনুকরণের আড়ম্বরের বহুল বাচালতার যুগে এই অন্তরের আবেদনটির মধুরতা সত্যই উপভোগ্য।"

অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন—

"শ্রীযুক্ত হরগোপাল বিশ্বাস প্রণীত "মাটির মায়া" পড়িলাম। পড়িয়া সত্যই বড় ভাল লাগিল। অতি সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাষায় বাঙ্গলার পল্লীর এবং পল্লীজীবনের নানান্ চিত্র কবি এমন সুন্দর সুনিপুণ ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন যে ছবিগুলি যেন পাঠকের মনে মুদ্রিত হইয়া যায়। বাঙ্গলার পল্লীর আমবাগান, বাঁশঝাড়, সরিষার ক্ষেত, খেয়াঘাট বাঙ্গলার খালবিল নদীতে মাছধরা, বাঙ্গলার শ্যামল প্রান্তরে ধানকাটা—এই সমস্তের এমন নিখুঁত বর্ণনা শীঘ্র পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বাঙ্গলার ঘরে ঘরে এই কাব্যগ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।"